

চতুর্থ অধ্যায়

শব্দ বুঝি বাক্য লিখি

১ম পরিচ্ছেদ

সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয়

নিচের গদ্যাংশটি এস. ওয়াজেদ আলির (১৮৯০-১৯৫১) লেখা একটি প্রবন্ধের অংশ। এটি লেখকের ‘ভবিষ্যতের বাঙালি’ বই থেকে নেওয়া। এস. ওয়াজেদ আলি উনিশ শতকের একজন সাহিত্যিক। তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ‘গুলদাস্তা’, ‘মোটরযোগে রীচি সফর’ ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ

এস. ওয়াজেদ আলি

মানুষ কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে থাকতে পারে না; সামাজিক স্বার্থের আকর্ষণও সে অনুভব করে। নিজের স্বার্থের এবং সামাজিক স্বার্থের কথা ভাবা তার পক্ষে স্বাভাবিক। স্বার্থপরতা আর পরার্থপরতা—দুটি মানুষের প্রকৃতিগত। আর একে ভিত্তি করেই তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবাদ রচিত হয়েছে।

তবে এ কথা সত্য যে, কোনো কোনো মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড়ো আকারে, কারো মধ্যে সামাজিক স্বার্থ বড়ো আকারে দেখা দেয়। যাদের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের মূল্য বেশি, তারা ধনী হয়, বিষয়-সম্পত্তি করে, নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যাদের কাছে সামাজিক স্বার্থের মূল্য বেশি, তারা দেশপ্রেমিক হয়, দেশের মঙ্গলের জন্য সাধনা করে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সেবায়, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

বলাবাহুল্য, এই শেষোক্ত শ্রেণির মানুষের উপরেই সমাজের মঙ্গল এবং উন্নতি নির্ভর করে। তাদের উৎসাহ এবং কর্মতৎপরতাই সমাজকে জীবনের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়, আর তাদের অবসাদ ও নিরুৎসাহ সমাজের পতন এবং মৃত্যুর কারণ হয়।

মানুষে আর পশুতে তফাত এই যে, মানুষের জীবন চিন্তার দ্বারা এবং পশুর জীবন দৈহিক প্রয়োজনের তাড়নায় পরিচালিত হয়। মানুষ যত উচ্চে উঠতে থাকে—চিন্তার, ভাবের প্রভাব তার জীবনে ততই বাড়তে থাকে। সভ্যতার বিকাশ এবং বিস্তারের মানেই হচ্ছে চিন্তার বিকাশ, ভাবের সম্প্রসারণ।

প্রত্যেক যুগেই মানুষ সামাজিক জীবনের একটা না একটা আদর্শ, একটা না একটা পরিকল্পনা নিয়ে তার বেষ্টনীর সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হলো তার মনের ইতিহাস; তার বিভিন্ন আদর্শের, তার বিভিন্ন পরিকল্পনার উৎপত্তি, বিকাশ এবং লয়ের ইতিহাস; এবং তার বিভিন্ন আদর্শ এবং পরিকল্পনার, দ্বন্দ্বের, মিলনের ও সংমিশ্রণের ইতিহাস। এই যে দ্বন্দ্ব, সংমিশ্রণ আর মিলন—এ অবিরামভাবে চলেছে আর চিরকালই চলবে। এই দ্বন্দ্ব, এই সংগ্রামে সেই ভাব, সেই পরিকল্পনাই জয়ী হয়—যা দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযোগী। যে ধারণা বা পরিকল্পনায় এ উপযোগিতার অভাব ঘটে, সেটি শেষে পরাভূত হয়; এবং সমাজদেহ থেকে

সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়; না হয়, সমাজদেহে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থান অধিকার করে পড়ে থাকে। মানবেতিহাসের রঞ্জামঞ্চে এইরূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন পরিকল্পনা এসেছে, দুদিনের জন্য নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছে, তারপর হয় মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়েছে, না হয় নায়কের ভূমিকা ছেড়ে কোনো ক্ষুদ্রতর ভূমিকা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

৪.১.১ বিভিন্ন গঠনের শব্দ খুঁজি

উপরের গদ্যাংশটি থেকে কমপক্ষে দুটি করে সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দ শনাক্ত করো। ১ম কলামে শব্দ লিখবে, ২য় কলামে শব্দটিকে ভাঙবে এবং ৩য় কলামে শব্দটি কীভাবে গঠিত তা লিখবে। লেখা হয়ে গেলে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। তিন ধরনের গঠিত শব্দের একটি করে উদাহরণ দেখানো হলো।

গঠিত শব্দ	শব্দটি ভাঙলে যেমন হবে	কীভাবে গঠিত
সমাজজীবন	সমাজ+জীবন	সমাসের মাধ্যমে
সম্প্রসারণ	সম্+প্রসারণ	উপসর্গের মাধ্যমে
সামাজিক	সমাজ+ইক	প্রত্যয়ের মাধ্যমে

শব্দগঠন

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের প্রধান উপায় তিনটি: সমাস, উপসর্গ এবং প্রত্যয়।

ক. সমাস

সমাস শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। দুটি শব্দ মিলে যখন একটি শব্দে পরিণত হয়, তখন তাকে সমাস বলে।

সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দের নমুনা: মা+বাবা=মা-বাবা; সিংহ+আসন=সিংহাসন;

ঘি+ভাজা=ঘিয়েভাজা; নীল+পদ্ম=নীলপদ্ম; অরুণ+রাঙা=অরুণরাঙা; রাজা+পথ=রাজপথ।

সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দকে বলা হয় সমস্তপদ। উপরের উদাহরণগুলোতে মা-বাবা, সিংহাসন, ঘিয়েভাজা, নীলপদ্ম, অরুণরাঙা ও রাজপথ—এগুলো সমস্তপদ। সমস্তপদের দুটি অংশ—পূর্বপদ ও পরপদ। এখানে মা, সিংহ, ঘি, নীল, অরুণ, রাজা হলো পূর্বপদ এবং বাবা, আসন, ভাজা, পদ্ম, রাঙা, পথ হলো পরপদ।

সমাস-সাধিত শব্দকে ব্যাখ্যা করা হয় যে শব্দগুচ্ছ দিয়ে তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। যেমন: ‘মা-বাবা’র ব্যাসবাক্য—মা ও বাবা, ‘সিংহাসন’ শব্দের ব্যাসবাক্য—সিংহ চিহ্নিত আসন, ‘ঘিয়েভাজা’ শব্দের ব্যাসবাক্য—ঘিয়ে ভাজা, ‘নীলপদ্ম’ শব্দের ব্যাসবাক্য—নীল যে পদ্ম, ‘অরুণরাঙা’ শব্দের ব্যাসবাক্য—অরুণের মতো রাঙা, ‘রাজপথ’ শব্দের ব্যাসবাক্য—পথের রাজা।

নিচে কিছু সমাস-সাধিত শব্দের নমুনা দেওয়া হলো:

শব্দ+শব্দ	সমাস-সাধিত শব্দ	ব্যাসবাক্য
জমা+খরচ	জমা-খরচ	জমা ও খরচ
স্বর্গ+নরক	স্বর্গ-নরক	স্বর্গ ও নরক
হাত+পা	হাত-পা	হাত ও পা
উনিশ+বিশ	উনিশ-বিশ	উনিশ ও বিশ
চোখে+মুখে	চোখে-মুখে	চোখে ও মুখে
খাস+জমি	খাসজমি	খাস যে জমি
আলু+সিদ্ধ	আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু
বিজয়+পতাকা	বিজয়-পতাকা	বিজয় নির্দেশক পতাকা
কাজল+কালো	কাজল-কালো	কাজলের মতো কালো
মুখ+চন্দ্র	মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়
বিষাদ+সিদ্ধ	বিষাদসিদ্ধ	বিষাদ রূপ সিদ্ধ
ছেলে+ভুলানো	ছেলে-ভুলানো	ছেলেকে ভুলানো

গাছ+পাকা	গাছপাকা	গাছে পাকা
মধু+মাথা	মধুমাথা	মধু দিয়ে মাথা
রান্না+ঘর	রান্নাঘর	রান্নার জন্য ঘর
গরু+গাড়ি	গরুরগাড়ি	গরুর গাড়ি
গা+হলুদ	গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
কান+কান	কানাকানি	কানে কানে যে কথা
চতুঃ+ভুজ	চতুর্ভুজ	চার ভুজ যে ক্ষেত্রের

৪.১.২ সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন করি

নিচের শব্দগুলোর আগে বা পরে অন্য শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ বানাও। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। একটি নুমনা করে দেখানো হলো।

শব্দ	আগে শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ	পরে শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ
বাগান	ফুলবাগান	বাগানবাড়ি
বই		
আকাশ		
তেল		
হাত		
মুখ		
ঘর		
রাস্তা		
ফল		

এভাবে নিজেরা শব্দের আগে-পরে শব্দ যোগ করে নতুন নতুন শব্দ বানানোর খেলা খেলতে পারো।

খ. উপসর্গ

যেসব শব্দের প্রথম অংশ সাধারণত কোনো অর্থ প্রকাশ করে না, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ থাকে, সেসব শব্দকে বলা হয় উপসর্গ-সাধিত শব্দ। উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত শব্দের নমুনা: পরা+জয়=পরাজয়; পরি+তাপ=পরিতাপ; বি+ফল=বিফল; আ+কাল=আকাল; উপ+গ্রহ=উপগ্রহ।

উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু অন্য শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়ে অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন: ‘দান’ শব্দটির পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গযোগে অনেকগুলো অর্থদ্যোতক শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন: অব+দান=অবদান, প্রতি+দান=প্রতিদান, প্র+দান=প্রদান ইত্যাদি।

নিচে কিছু উপসর্গ-সাধিত শব্দের নমুনা দেওয়া হলো:

উপসর্গ+শব্দ	নতুন শব্দ	উপসর্গের অর্থ-দ্যোতনা
অ+কাজ	অকাজ	অনুচিত
অতি+কায়	অতিকায়	বৃহৎ
অধি+বাসী	অধিবাসী	মধ্যে
অনা+বৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অভাব
অনু+গমন	অনুগমন	পিছনে
অপ+কর্ম	অপকর্ম	মন্দ
অব+দান	অবদান	বিশেষ
আ+রক্তিম	আরক্তিম	সামান্য
উৎ+ক্ষেপণ	উৎক্ষেপণ	উর্ধ্বে
উপ+কূল	উপকূল	নিকট
কু+পথ	কুপথ	অসৎ
গর+হাজির	গরহাজির	বিপরীত
দর+দালান	দরদালান	মধ্যে
দুঃ+শাসন	দুঃশাসন	খারাপ
দুর্+মূল্য	দুর্মূল্য	বেশি
দুস্+প্রাপ্য	দুস্প্রাপ্য	অল্প
না+লায়েক	নালায়েক	অপূর্ণ
নি+খাদ	নিখাদ	নেই এমন

নিঃ+শেষ	নিঃশেষ	পুরোপুরি
নির্+গমন	নির্গমন	বাইরে
নিষ্+তরঙ্গ	নিস্তরঙ্গ	নেই এমন
নিম+রাজি	নিমরাজি	প্রায়
পরা+জয়	পরাজয়	বিপরীত
পরি+ত্যাগ	পরিত্যাগ	সম্পূর্ণ
পাতি+হাঁস	পাতিহাঁস	ছোটো
প্র+গতি	প্রগতি	প্রকৃষ্ট
প্রতি+হিংসা	প্রতিহিংসা	পালটা
বদ+মেজাজ	বদমেজাজ	উগ্র
বি+জ্ঞান	বিজ্ঞান	বিশেষ
বে+দখল	বেদখল	হারানো
ভর+পেট	ভরপেট	পূর্ণ
স+ঠিক	সঠিক	পুরোপুরি
সম্+যোজন	সংযোজন	একত্র
সু+দিন	সুদিন	ভালো
হা+ভাত	হাভাত	অভাব

৪.১.৩ উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন করি

নিচের ছকের প্রথম কলামে কয়েকটি উপসর্গ দেওয়া হলো। এসব উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত হয় এমন শব্দ মাঝের কলামে লেখো। তৃতীয় কলামে লেখো উপসর্গ-সাধিত শব্দটি। তোমার বানানো শব্দগুলো যেন উপরের উপসর্গ-সাধিত শব্দের উদাহরণ থেকে আলাদা হয়। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

উপসর্গ	শব্দ	উপসর্গ-সাধিত শব্দ
অ+	চেনা	অচেনা
অতি+		

অধি+		
অনা+		
অনু+		
অপ+		
অব+		
আ+		
উৎ+		
উপ+		
কু+		
গর+		
দর+		
দুঃ+		
দুর্+		
দুস্+		
না+		
নি+		
নিঃ+		
নির্+		
নিস্+		

নিম+		
পরা+		
পরি+		
পাতি+		
প্র+		
প্রতি+		
বদ+		
বি+		
বে+		
ভর+		
স+		
সম্+		
সু+		
হা+		

গ. প্রত্যয়

যেসব শব্দের প্রথম অংশ অর্থযুক্ত এবং দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন, সেসব শব্দকে বলা হয় প্রত্যয়-সাধিত শব্দ। যেমন: দিন+ইক=দৈনিক। এখানে ‘দিন’ শব্দের পরে ‘ইক’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ ‘দৈনিক’ তৈরি হয়েছে। এভাবে প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দের উদাহরণ: পড়্+উয়া=পড়ুয়া; চল্+অন্ত=চলন্ত; ফুল+দানি=ফুলদানি; ঢাকা+আই=ঢাকাই ইত্যাদি।

খেয়াল করো, উপরের প্রথম দুটি শব্দের প্রথম অংশ ‘পড়্’ এবং ‘চল্’ হলো ক্রিয়ামূল। ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রত্যয়কে বলে কৃৎপ্রত্যয়। এখানে ‘উয়া’ ও ‘অন্ত’ হলো কৃৎপ্রত্যয়।

আবার পরের দুটি শব্দের প্রথম অংশ ‘ফুল’ ও ‘ঢাকা’ হলো নামশব্দ। নামশব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রত্যয়কে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। এখানে ‘দানি’ ও ‘আই’ হলো তদ্ধিত প্রত্যয়।

প্রত্যয়-সাধিত কিছু শব্দের নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

শব্দগঠন	প্রত্যয়-সাধিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
পঠ্+অক	পাঠক	কৃৎ প্রত্যয়
দুল্+অনা	দোলনা	কৃৎ প্রত্যয়
মান্+অনীয়	মাননীয়	কৃৎ প্রত্যয়
উড়্+অন্ত	উড়ন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
বাঘ+আ	বাঘা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাবনা+আই	পাবনাই	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাড়ি+আন	গাড়োয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বিবি+আনা	বিবিয়ানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাবু+আনি	বাবুয়ানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাল্+আনো	চালানো	কৃৎ প্রত্যয়
পাগল+আমি	পাগলামি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভিখ্+আরি	ভিখারি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বোমা+আরু	বোমারু	তদ্ধিত প্রত্যয়
জমক+আলো	জমকালো	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভাজ্+ই	ভাজি	কৃৎ প্রত্যয়
বিজ্ঞান+ইক	বৈজ্ঞানিক	তদ্ধিত প্রত্যয়
কণ্টক+ইত	কণ্টকিত	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঠ্+ইত	পঠিত	কৃৎ প্রত্যয়
নীল+ইমা	নীলিমা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঙ্ক+ইল	পঙ্কিল	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রাণ+ঈ	প্রাণী	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাষ্ট্র+ঈয়	রাষ্ট্রীয়	তদ্ধিত প্রত্যয়

মিশ্+উক	মিশুক	কৃৎ প্রত্যয়
পড়্+উয়া	পড়ুয়া	কৃৎ প্রত্যয়
ঘর+উয়া	ঘরোয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
রিকশা+ওয়ালা	রিকশাওয়ালা	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছাপা+খানা	ছাপাখানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৃ+তব্য	কর্তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
দীর্ঘ+তম	দীর্ঘতম	তদ্ধিত প্রত্যয়
শত্রু+তা	শত্রুতা	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাট্+তি	কাটতি	কৃৎ প্রত্যয়
কবি+ত্ব	কবিত্ব	তদ্ধিত প্রত্যয়
অংশী+দার	অংশীদার	তদ্ধিত প্রত্যয়
রীধ্+না	রান্না	কৃৎ প্রত্যয়
গিন্মি+পনা	গিন্মিপনা	তদ্ধিত প্রত্যয়
খান্দা+বাজ	খান্দাবাজ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দয়া+বান	দয়াবান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বুদ্ধি+মান	বুদ্ধিমান	তদ্ধিত প্রত্যয়
সুন্দর+য	সৌন্দর্য	তদ্ধিত প্রত্যয়
মধু+র	মধুর	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঘ+লা	মেঘলা	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানান+সই	মানানসই	তদ্ধিত প্রত্যয়

৪.১.৪ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করি

নিচের হকের দ্বিতীয় কলামে কয়েকটি প্রত্যয় দেওয়া হলো। প্রথম কলামে এমন কিছু ক্রিয়ামূল বা নামশব্দ লেখো যেগুলো এসব প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। তৃতীয় কলামে লেখো প্রত্যয়-সাধিত শব্দটি। তোমার বানানো শব্দগুলো যেন উপরের প্রত্যয়-সাধিত শব্দের উদাহরণ থেকে আলাদা হয়। কাজ শেষে সহপাঠীকে তোমার কাজ

দেখাও, তুমিও তার কাজ দেখো এবং একে অপরের কাজ নিয়ে আলোচনা করো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

ক্রিয়ামূল বা নামশব্দ	প্রত্যয়	প্রত্যয়-সাম্বিত শব্দ
শিক্ষা	+অক	শিক্ষক
	+অনা	
	+অনীয়	
	+অন্ত	
	+আ	
	+আই	
	+আন	
	+আনা	
	+আনি	
	+আনো	
	+আমি	
	+আরি	
	+আরু	
	+আলো	
	+ই	
	+ইক	
	+ইত	
	+ইমা	
	+ইল	

	+ঈ	
	+ঈয়	
	+উক	
	+উয়া	
	+ওয়ালা	
	+থানা	
	+তব্য	
	+তম	
	+তা	
	+তি	
	+ত্ব	
	+দার	
	+না	
	+পনা	
	+বাজ	
	+বান	
	+মান	
	+য	
	+র	
	+লা	
	+সই	

২য় পরিচ্ছেদ

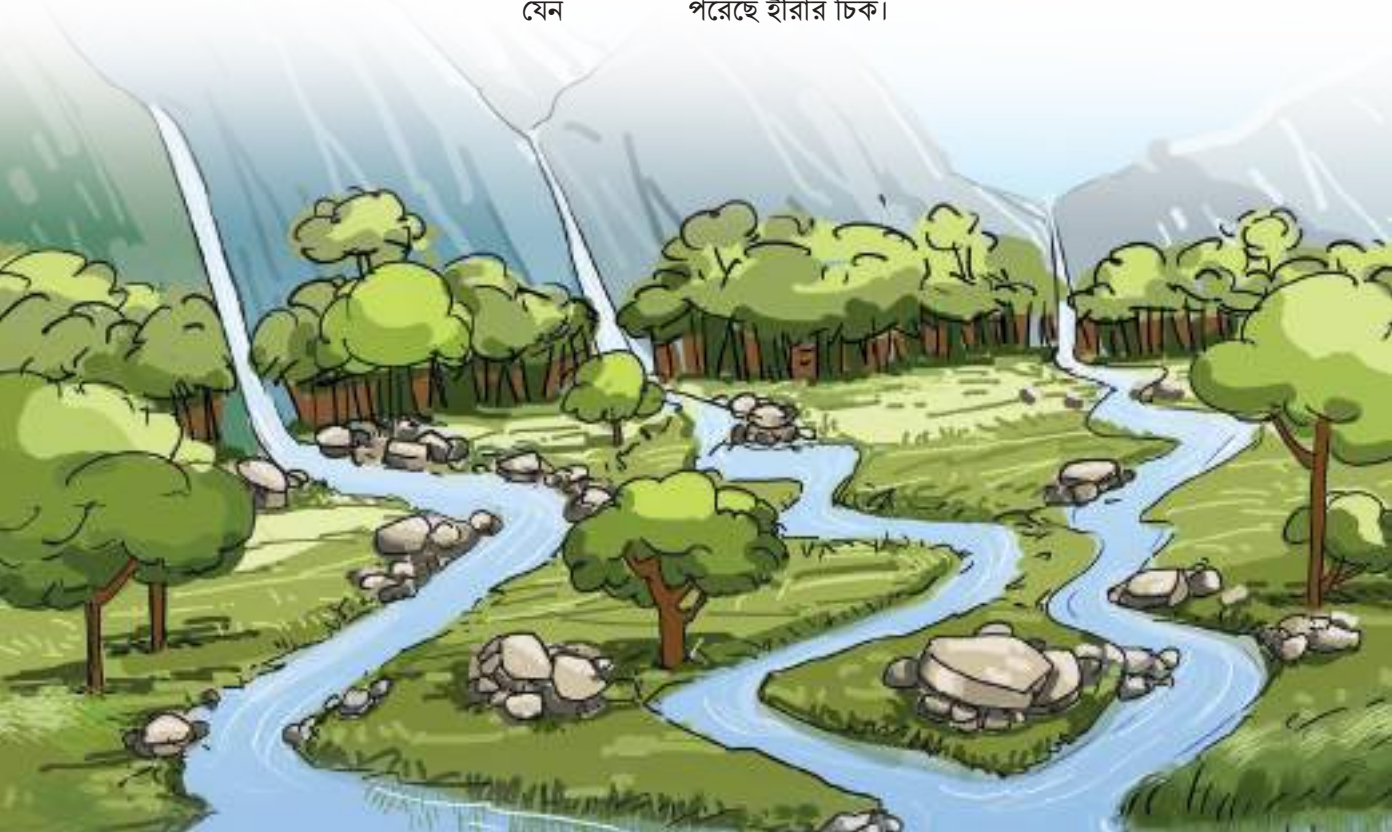
শব্দদ্বিত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ভাষার প্রধান কবি। সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম ‘সোনারতরী’, ‘বলাকা’, ‘পুনশ্চ’, ‘গল্পগুচ্ছ’, ‘গোরা’, ‘কালান্তর’, ‘ডাকঘর’ ইত্যাদি। ১৯১৩ সালে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নদী’ কাব্যের কিছু অংশ সংকলিত হলো।

নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদী	যত আগে আগে চলে
ততই	সাথি জোটে দলে দলে।
তারা	তারি মতো, ঘর হতে
সবাই	বাহির হয়েছে পথে।
পায়ে	ঠুনঠুন বাজে নুড়ি,
যেন	বাজিতেছে মল চুড়ি।
গায়ে	আলো করে ঝিকিঝিক,
যেন	পরেছে হীরার চিক।



মুখে	কলকল কত ভাষে
এত	কথা কোথা হতে আসে।
শেষে	সখীতে সখীতে মেলি
হেসে	গায়ে গায়ে হেলাহেলি।
শেষে	কোলাকুলি কলরবে
তারা	এক হয়ে যায় সবে।
তখন	কলকল ছুটে জল—
কাঁপে	টলমল ধরাতল,
কোথাও	নিচে পড়ে ঝরঝর—
পাথর	কেঁপে ওঠে থরথর,
শিলা	খানখান যায় টুটে—
নদী	চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে	গাছগুলো বড়ো বড়ো
তারা	হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।
কত	বড়ো পাথরের চাপ
জলে	খসে পড়ে বুপঝাপ।
তখন	মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা	ভেসে যায় দলে দলে।
জলে	পাক ঘুরেঘুরে ওঠে,
যেন	পাগলের মতো ছোটো।
কোথাও	ধু ধু করে বালুচর
সেথায়	গাঙশালিকের ঘর।
সেথায়	কাছিম বালির তলে
আপন	ডিম পেড়ে আসে চলে।
সেথায়	শীতকালে বুনো হাঁস
কত	ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।
সেথায়	দলে দলে চখাচখি
করে	সারাদিন বকাবকি।
সেথায়	কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায়	খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
 কভু কোথাও সে নাহি থামে।
 সেথায় গহন গভীর বন,
 তীরে নাহি লোক নাহি জন।
 শুধু কুমির নদীর ধারে
 সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
 বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে,
 ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
 কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ,
 তাহার গায়ে চাকাচাকা দাগ।
 রাতে চুপিচুপি আসে ঘাটে,
 জল চকো চকো করি চাটে।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
 নদী ফুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে।
 তখন কানায় কানায় জল,
 কত ভেসে আসে ফুল ফল।
 ঢেউ হেসে ওঠে খলখল,
 তরী করি ওঠে টলমল।
 নদী অজগরসম ফুলে
 গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
 আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে,
 তখন জল যায় সরে সরে।
 তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
 কাদা দেখা দেয় দুই পাশে।
 বেরোয় ঘাটের সোপান যত
 যেন বুকের হাড়ের মতো।

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

অজগরসম: অজগরের মতো।

কানায় কানায়: পরিপূর্ণ।

গহন: নিবিড়।

চিক: গলায় পরার অলংকার।

টুটা: ভাঙা।

ধরাতল: পৃথিবী।

মল: পায়ের অলংকার।

সোপান: সিঁড়ি।

৪.২.১ শব্দদ্বিত্ব খুঁজি

‘নদী’ কবিতায় এমন কিছু শব্দের প্রয়োগ আছে যেগুলো একই রকমের দুটি শব্দ দিয়ে তৈরি; যেমন কল+কল=কলকল। কিছু শব্দ আবার সামান্য বদলে ভিন্ন রকম হয়েছে; যেমন হেলা+হেলি=হেলাহেলি। আবার কিছু শব্দ পাশাপাশি দুইবার এসেছে; যেমন ঘুরে+ঘুরে=ঘুরে ঘুরে। কবিতাটি থেকে এই ধরনের অন্তত দশটি শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচে লেখো। লেখা শেষ হলে সহপাঠীর সঙ্গে মেলাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো।

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

শব্দদ্বিত্ব

অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দদ্বিত্ব বলে। শব্দদ্বিত্ব তিন ধরনের: ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব, অনুকার দ্বিত্ব ও পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

ক. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব

কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। একাধিক ধ্বন্যাত্মক শব্দ মিলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়। যেমন, কোনো ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য কিছুর সংঘর্ষে ‘ঠন’ ধ্বনি শোনা যায়। এই ‘ঠন’ একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ‘ঠন’ শব্দটি পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে ‘ঠন ঠন’ ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ে কল্পিত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হতে পারে। যেমন—টনটন, ছমছম।

কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ:

কুট কুট, কৌত কৌত, কুটুস-কুটুস, খক খক, খুটুর-খুটুর, টুং টুং, ঠুক ঠুক, ধুপ ধুপ, দুম দুম, ঢং ঢং, চকচক, জ্বলজ্বল, বামবাম, টসটস, থকথকে, ফুসুর ফাসুর, ভটভট, শৌ শৌ, হিস হিস।

খ. অনুকার দ্বিত্ব

পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়। যেমন: অঙ্ক-টঙ্ক, চুপচাপ ইত্যাদি।

অনুকার দ্বিত্বের দ্বিতীয় অংশে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটে; যেমন:

অঙ্ক-টঙ্ক, আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, গরু-টরু, ছাগল-টাগল, ঝাল-টাল, হেন-তেন, লুচিফুচি, টাটু-ফাটু, আগড়ম-বাগড়ম, এলোমেলো, ঝিকিমিকি, কচর-মচর, ঝিলমিল, শেষ-মেষ, অল্পসল্প, বুদ্ধিশুদ্ধি, গুটিশুটি, মোটাসোটা, নরম-সরম, ব্যাপার-স্যাপার, বুঝে-সুঝে।

অনুকার দ্বিত্বের দ্বিতীয় অংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে; যেমন:

আড়াআড়ি, খোঁজাখুঁজি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, ঠেকাঠেকি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি, দামাদামি, পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি, টুকরো-টাকরা, ধারধোর, জোগাড়-জাগাড়।

গ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব

একই শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে। যেমন: জ্বর জ্বর, হাতে হাতে ইত্যাদি।

পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন হতে পারে; যেমন:

পর পর, কবি কবি, ভালো ভালো, কত কত, হঠাৎ হঠাৎ, ঘুম ঘুম, উড়ু উড়ু, গরম গরম, হায় হায়।

পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিসম্পন্ন হতে পারে; যেমন:

হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে, মজার মজার, ঝাঁকে ঝাঁকে, চোখে চোখে, মনে মনে, সুরে সুরে, পথে পথে।

৪.২.২ কোন ধরনের শব্দদ্বিত্ব

নিচের বাক্যগুলোতে কোন ধরনের শব্দদ্বিত্ব ব্যবহৃত হয়েছে তা কারণসহ বলো। প্রয়োজনে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারো।

- ক. কদিন ধরে আমার **জ্বর জ্বর** লাগছে।
- খ. ঠাকুরমার ঝুলিতে অনেক **মজার মজার** গল্প আছে।
- গ. এ বয়সে মন **উড়ু উড়ু** হওয়াটাই স্বাভাবিক।
- ঘ. এখন থেকে তাকে **চোখে চোখে** রাখতে হবে।
- ঙ. রাত্রির গাড়ি অন্ধকারেও বিড়ালের চোখ **জলজল** করে।
- চ. কোনো বিষয়ে **বাড়াবাড়ি** করা ভালো নয়।
- ছ. কদিন আগেও তো তাদের মধ্যে **গলাগলি** দেখলাম!
- জ. লোকটি **হনহন** করে হেঁটে গেল।
- ঝ. **শনশন** বায়ু বইছে।
- ঞ. আজ হাড় **কনকনে** শীত!
- ট. **কবি কবি** চেহারা অমলের।

৪.২.৩ শব্দদ্বিত্ব দিয়ে বাক্য বানাই

নিচের শব্দদ্বিত্বগুলো ব্যবহার করে বাক্য বানাও (যে কোনো দশটি):

কথায় কথায়, টাপুর টুপুর, রোজ রোজ, বামবাম, চুপচাপ, ছমছম, কনকনে, আশায় আশায়, ঘুম ঘুম, ঠুক ঠুক, ঢং ঢং, ঘর-টর, হায় হায়, ভুলটুল, ব্যাপার স্যাপার।

১. _____

২. _____

৩. _____

৪. _____

৫. _____

৬. _____

৭. _____

৮. _____

৯. _____

১০. _____

৩য় পরিচ্ছেদ

বাক্য

৪.৩.১ উদ্দেশ্য ও বিধেয় খুঁজি

নিচের বাক্যগুলো পড়ো।

ক. সিনথিয়া বই পড়ছে।

খ. পাখিগুলো গাছের ডালে বসে সুমধুর স্বরে গান করছে।

গ. সাদা-কালো ডোরাকাটা জামাটা ছিঁড়ে গেছে।

ঘ. আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এদিকেই আসছেন।

ঙ. সেলিম সাহেবের ছেলে পিয়াস সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে।

উপরের বাক্যগুলোতে কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, তা বাম কলামে লেখো। আর তার উদ্দেশ্যে কী বলা হচ্ছে, তা ডান কলামে লেখো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে?	কী বলা হচ্ছে?
সিনথিয়া	বই পড়ছে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

একটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে: উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

উদ্দেশ্য: কোনো বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন: জনি বই পড়ে। এই বাক্যে ‘জনি’ হলো উদ্দেশ্য।

বিধেয়: বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। আগের বাক্যে ‘বই পড়ে’ হলো বিধেয়।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সঙ্গে এক বা একাধিক শব্দ যোগ করে বাক্যকে দীর্ঘ করা যায়। উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের সঙ্গে যুক্ত এসব শব্দকে প্রসারক বলে।

উদ্দেশ্যের প্রসারক: ‘জনি বই পড়ে।’—এই বাক্যে ‘জনি’র আগে ‘রনির ছোটো ভাই’ যোগ করা যায়। তখন বাক্যটি হবে: ‘রনির ছোটো ভাই জনি বই পড়ে।’ এখানে, ‘রনির ছোটো ভাই’ শব্দগুচ্ছ উদ্দেশ্যের প্রসারক।

বিধেয়ের প্রসারক: ‘জনি বই পড়ে।’—এই বাক্যে ‘বই পড়ে’র আগে ‘রোজ সকালে’, ‘টেবিলে বসে’ যোগ করা যায়। তখন বাক্যটি হবে: ‘রনির ছোটো ভাই জনি রোজ সকালে টেবিলে বসে বই পড়ে।’ এখানে ‘রোজ সকালে’ ও ‘টেবিলে বসে’ শব্দগুচ্ছ বিধেয়ের প্রসারক। বিধেয়ের প্রসারক অনেক সময়ে উদ্দেশ্যের আগেও বসতে পারে। যেমন, এই বাক্যটি এভাবেও বলা যেত: ‘রোজ সকালে রনির ছোটো ভাই জনি টেবিলে বসে বই পড়ে।’

৪.৩.২ প্রসারক যোগ করি

নিচে কিছু বাক্য দেওয়া আছে। নির্দেশনা অনুযায়ী বাক্যগুলোতে উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো।

১. বাতাস বইছে। (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)

২. সুমি কোথায় গেল? (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)

৩. সিরাজউদ্দৌলা অল্প বয়সে সিংহাসনে বসেছিলেন। (উদ্দেশ্যের প্রসারক যোগ করো)

৪. পাখি ওড়ে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৫. সুন্দরবনের বাঘ কমে যাচ্ছে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৬. আমার দেওয়া কলমটি হারিয়ে গেছে। (বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৭. গাছ লাগিয়েছি। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৮. স্কুল ছুটি হবে। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৯. মানুষ সফল হয়। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

১০. বাতাস ঠান্ডা। (উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক যোগ করো)

৪র্থ পরিচ্ছেদ

সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ

৪.৪.১ শব্দের মিল-অমিল খুঁজি

নিচের বাক্যগুলোতে দাগ দেওয়া শব্দগুলোর মধ্যে কী ধরনের মিল বা অমিল আছে, উল্লেখ করো।

- (ক) অন্য মানুষের অন্ন চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না।
 (খ) আশা করছি শীঘ্রই তাদের আসা হবে।
 (গ) কোন সালে শাল গাছগুলো লাগানো হয়েছে, জানি না।
 (ঘ) সাধ হলো তরকারির স্বাদ চেখে দেখি!
 (ঙ) লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করা কি কারো জীবনের লক্ষ্য হতে পারে?

সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর উচ্চারণ এক অথবা প্রায় এক, কিন্তু অর্থ ভিন্ন; এগুলোকে সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের বানান ভিন্ন হয়, তবে উচ্চারণ এক হওয়ায় কানে শুনে এদের পার্থক্য করা যায় না। বাক্যে ব্যবহৃত হলে প্রসঙ্গ বিবেচনায় এসব শব্দের পার্থক্য বোঝা যায়।

নিচে কিছু সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো।

{ অণু - ক্ষুদ্রতম অংশ অনু - পশ্চাৎ	{ অর্ঘ - দাম অর্ঘ্য - পূজার উপকরণ	{ ইন্দ্রি - ধোপার যন্ত্র স্ট্রী - পত্নী
{ অন্ত - শেষ অন্তঃ - ভিতর	{ অশ্ব - ঘোড়া অশ্ম - পাথর	{ উদ্যত - প্রবৃত্ত উদ্ধত - অবিনীত
{ অন্ন - ভাত অন্য - অপর	{ ঐশ - তত্ত্ব ঐষ - আমিষ	{ ওষধি - একবার ফল দেওয়া গাছ ঔষধি - ভেষজ উদ্ভিদ
{ অন্যান্য - অপরাপর অনন্য - একক	{ আদা - মসলাবিশেষ আধা - অর্ধেক	{ কটি - কোমর কোটি - শত লক্ষ
{ অপত্য - সন্তান অপথ্য - যা পথ্য নয়	{ আবরণ - আচ্ছাদন আভরণ - অলংকার	{ কড়া - আংটা করা - কৃত
{ অবিনীত - উদ্ধত অভিনীত - অভিনয় করা	{ আভাস - ইঞ্জিত আবাস - বাসস্থান	{ কতক - কিছু কথক - বক্তা
{ অবিহিত - অন্যায় অভিহিত - কথিত	{ আশা - আকাঙ্ক্ষা আসা - আগমন	{ কমল - পদ্ম কোমল - নরম

{কাঁচা - অপক্ক
কাচা - ধোয়া
কাঁচি - কাস্তে
কাছি - মোটা দড়ি
কাঁটা - কণ্টক
কাটা - কর্তন
কাঁদা - ক্রন্দন
কাদা - পাক
কাক - পাখিবিশেষ
কাঁথ - কোল
কুল - বংশ
কুল - তীর
কৃত - যা করা হয়েছে
ক্ৰীত - কেনা
কৃতজ্ঞ - উপকার স্বীকারকারী
কৃতঘ্ন - উপকারীর ক্ষতিকারী
কৃতি - কাজ
কৃতী - সফল
খড় - তৃণ
খর - তীর
খদ্দর - কাপড়
খদ্দের - গ্রাহক
খুর - পশুর পায়ের অংশ
ক্ষুর - কামানোর অস্ত্র
গর্ব - অহংকার
গর্ভ - পেট
গা - শরীর
গাঁ - গ্রাম
গাথা - কাহিনি
গাঁথা - গ্রন্থন
গাধা - গর্দভ
গাঁদা - ফুলবিশেষ
গোড়া - মূল অংশ
গৌড়া - রক্ষণশীল
ঘড়া - বড়ো কলসি
গড়া - তৈরি করা

{ঘর - বাসগৃহ
গড় - দুর্গ
ঘোড়া - অশ্ব
ঘোরা - ঘূর্ণন
চড় - চপেটাঘাত
চর - ভূমিবিশেষ
চারার - ছোটো গাছ
চাড়া - জেগে ওঠা
ছাঁদ - আকৃতি
ছাদ - চাল
ছাড় - ত্যাগ
ছার - অধম
ছোঁড়া - বালক
ছোড়া - নিক্ষেপ করা
জলা - জলাশয়
জ্বলা - পোড়া
জাল - ফাঁদ
জ্বাল - উত্তাপ
জালা - মাটির বড়ো পাত্র
জ্বালা - যন্ত্রণা
জিভ - জিহ্বা
জীব - প্রাণী
জোর - শক্তি
জোড় - জোড়া
জ্যেষ্ঠ - বড়ো
জ্যেষ্ঠ - বাংলা দ্বিতীয় মাস
জ্যোতি - আলো
যতি - বিরাম
ঝুড়ি - চাঙাড়ি
ঝুরি - বটের শিকড়
টিকা - রোগ প্রতিরোধক
টাকা - ব্যাখা
ডাল - শাখা
ঢাল - বর্ম
ঢাক - বাদ্যযন্ত্র
ডাক - যোগাযোগ ব্যবস্থা

{তত্ত্ব - গূঢ় অর্থ
তথ্য - জ্ঞাতব্য বিষয়
তড়িৎ - বিদ্যুৎ
ত্বরিত - দ্রুত
তারার - নক্ষত্র
তাড়ার - ব্যস্ততা
তোড়ার - গুচ্ছ
তোরার - তোমরা
দন্ত - দাঁত
দন্ত্য - দাঁত-বিষয়ক
দিন - দিবস
দীন - দরিদ্র
দীপ - প্রদীপ
দ্বীপ - জলবেষ্টিত ভূখণ্ড
দূতী - নারী সংবাদবাহক
দ্যুতি - আলো
দৃপ্ত - বলিষ্ঠ
দীপ্ত - উজ্জ্বল
দেশ - রাজ্য
দ্বেষ - হিংসা
ধরণ - ধরা
ধরন - প্রকার
ধুম - প্রাচুর্য
ধূম - ধোয়া
ধোয়া - ধৌত
ধোঁয়া - ধূম্র
নভ - আকাশ
নব - নতুন
নারী - স্ত্রীলোক
নাড়ি - শিরা
নিতি - রোজ
নীতি - নিয়ম
নিত্য - প্রতিদিন
নৃত্য - নাচ
নিরস্ত - অস্ত্রহীন
নিরস্ত - ক্ষান্ত

{ নীড় - পাখির বাসা
 { নীর - পানি
 { পটল - অধ্যায়
 { পটোল - সবজিবিশেষ
 { পদ্য - কবিতা
 { পদ্ম - কমল
 { পরা - পরিধান করা
 { পড়া - পাঠ
 { পরিচ্ছদ - পোশাক
 { পরিচ্ছেদ - অধ্যায়
 { পাট - উদ্ভিদবিশেষ
 { পাঠ - পড়া
 { পার - তীর
 { পাড় - প্রান্ত
 { পিঠ - পৃষ্ঠ
 { পীঠ - স্থান
 { পুরি - লুচি
 { পুরী - নিকেতন
 { প্রসাদ - অনুগ্রহ
 { প্রাসাদ - বড়ো দালান
 { ফোঁটা - বিন্দু
 { ফোটা - প্রস্ফুটিত
 { বর্ষা - ঋতু
 { বর্শা - অস্ত্রবিশেষ
 { বা - অথবা
 { বাঁ - বাম
 { বাক - কথা
 { বাঁক - বাঁকা
 { বাইশ - ২২ সংখ্যা
 { বাইস - ধারালো যন্ত্র
 { বাধা - বিঘ্ন
 { বাঁধা - বন্ধন
 { বাড়ি - ঘর
 { বারি - পানি

{ বাণ - শর
 { বান - বন্যা
 { বাণী - কথা
 { বানি - গয়নার মজুরি
 { বিভূ - ধন
 { বৃত্ত - গোলাকার
 { বিনা - ব্যতীত
 { বীণা - বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
 { বিশ - ২০ সংখ্যা
 { বিষ - গরল
 { বিস্মিত - চমৎকৃত
 { বিস্মৃত - ভুলে যাওয়া
 { বোঁজা - বন্ধ
 { বোঝা - ভার
 { ভাষা - কথা
 { ভাসা - ভেসে থাকা
 { মতি - বুদ্ধি
 { মোতি - মুক্তা
 { মরা - মৃত
 { মড়া - মৃতদেহ
 { মাস - ৩০ দিন
 { মাষ - ডালবিশেষ
 { মুখ - বদন
 { মূক - বোবা
 { মূর্খ - জ্ঞানহীন
 { মুখ্য - প্রধান
 { মোড়ক - আচ্ছাদনী
 { মড়ক - মহামারী
 { যজ্ঞ - উৎসব
 { যোগ্য - উপযুক্ত
 { যুগ - কাল
 { যোগ - মিলন
 { লক্ষ - শত সহস্র
 { লক্ষ্য - উদ্দেশ্য

{ শব - লাশ
 { সব - সকল
 { শয্যা - বিছানা
 { সজ্জা - সাজ
 { শর - তির
 { স্বর - সুর
 { শরণ - আশ্রয়
 { স্মরণ - স্মৃতি
 { স্বাদ - আস্বাদ
 { সাধ - ইচ্ছা
 { শাপ - অভিশাপ
 { সাপ - সর্প
 { শাল - গাছবিশেষ
 { সাল - বছর
 { শিকার - মৃগয়া
 { স্বীকার - মেনে নেওয়া
 { শুচি - পবিত্র
 { সূচি - তালিকা
 { শোনা - শ্রবণ করা
 { সোনা - স্বর্ণ
 { সর্গ - অধ্যায়
 { স্বর্গ - বেহেশত
 { সম্প্রতি - আজকাল
 { সম্প্রীতি - সন্তোষ
 { সাক্ষর - অক্ষর সংবলিত
 { স্বাক্ষর - দস্তখত
 { সাধু - সৎ
 { স্বাদু - স্বাদযুক্ত
 { হাড় - অস্থি
 { হার - গলার মালা

৪.৪.২ সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ দিয়ে বাক্য বানাই

নিচের দশ জোড়া সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে দশটি বাক্য তৈরি করো। এমনভাবে বাক্য তৈরি করতে হবে যাতে একটি বাক্যেই শব্দজোড়গুলো থাকে। যেমন—আদা ও আধা ব্যবহার করে বানানো বাক্য: আধা কেজি আদা কিনলাম।

কাঁচা ও কাচা, কাঁদা ও কাদা, দিন ও দীন, দীপ ও দ্বীপ, বিত্ত ও বৃত্ত, নভ ও নব, শব ও সব, শয্যা ও সজ্জা, শোনা ও সোনা, হার ও হাড়।

১. _____

২. _____

৩. _____

৪. _____

৫. _____

৬. _____

৭. _____

৮. _____

৯. _____

১০. _____

৫ম পরিচ্ছেদ

বানান ও অভিধান

শব্দে বর্ণের বিন্যাসকে বানান বলে। প্রতিটি শব্দের সুনির্দিষ্ট বানান থাকে। লিখিত ভাষায় শব্দের এই সুনির্দিষ্ট বানান অনুসরণ করতে হয়।

অভিধান এমন একটি বই যেখানে কোনো ভাষার যাবতীয় শব্দের বানান, উচ্চারণ, অর্থ, গঠন, উৎস, ব্যবহার ইত্যাদি সংকলিত হয়। অভিধানের শব্দগুলো বর্ণের ক্রম অনুযায়ী সাজানো থাকে।

৪.৫.১ বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজাই

বাংলা বর্ণমালায় বর্ণগুলো যেভাবে সাজানো থাকে, অভিধানে বর্ণের ক্রম তার থেকে একটু ভিন্ন। অভিধানে বর্ণের ক্রম নিম্নরূপ:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ঁ ং

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ঢ় ণ ত (ৎ) থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ।

নিচের বাম কলামের শব্দগুলোকে অভিধানের বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে ডান কলামে লেখো। লেখা শেষ হলে সহপাঠীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি করে দেখানো হলো।

এলোমেলো শব্দ	বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজানো শব্দ
তাল পাটি দই আতা জাহাজ টমেটো শশা	আতা জাহাজ টমেটো তাল দই পাটি শশা
কাক কৃতজ্ঞ কোল কৌতুক কুলা কলা	
তিসি তুলনা তুলা তাল তারুণ্য	
পরিবর্তন একতা ভয় আজ শহর গ্রাম	
জুঁই ঝাল চাঁদ জামা জাঁতা চিল ছাল চাই	
নকশা নির্ভয় নিঃশঙ্ক নিঃসংকোচ নিষ্পেষণ নিদ্রা	
রাক্ষস ব্যয় স্বাধীনতা স্বার্থ সার্থক ভ্রাতা শ্মশান রশ্মি	

৪.৫.২ বানান ঠিক করি

নিচে কাজী মোতাহার হোসেনের (১৮৯৭-১৯৮১) লেখা একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ দেওয়া হলো। কাজী মোতাহার হোসেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধের প্রধান বিষয় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। তিনি ঢাকার ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ নামের একটি যুক্তিবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে ‘সঞ্চয়ন’, ‘সেই পথ লক্ষ্য করে’, ‘আলোকবিজ্ঞান’ ইত্যাদি।

নিচের লেখায় কিছু শব্দের বানান পরিবর্তন করে দেওয়া হলো। শব্দগুলো সবুজ রঙে চিহ্নিত করা আছে। এসব শব্দের বানান অভিধানের সহায়তা নিয়ে ঠিক করো।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেন

কোন **জাতী** কতটা সভ্য, তা **নির্নয়** করবার সবচেয়ে **উৎকৃষ্ট** মাপকাঠি হচ্ছে তার **শিক্ষাব্যবস্থা**, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য। এ সবার ভিতর দিয়ে জাতির আশা-আকাংখা পরিস্ফুট হয়; নৈতিক ও সামাজিক মানের পরিমাপ করা যায়; এবং কর্মক্ষমতা, চরিত্রগত **বৈশিষ্ট**, এক কথায় জাতীয় আদর্শের ভিত্তি-ভূমির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। **জাতিয়** ঐতিহ্য অবশ্যই অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানের চেষ্টায় **পরিপুষ্ট** হয়। তাছাড়া এর ভবিষ্যৎ **স্থায়ীত** ও উন্নতির জন্য শিশু, কিশোর ও নওজোয়ানদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে দিতে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার এত **গুরুত্ব**।

মায়ের পেট থেকে পড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এর আগে পিতামাতার **মনবৃত্তি**, পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈহিক দোষগুণ প্রভৃতির প্রভাব কিছুটা **উত্তরাধীকার**-সূত্রে শিশুর উপর বর্তে। এই কারণে **বয়স্কদেরও** বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই ধরনের শিক্ষার **অস্তিত্ব** নেই বললেই চলে। ফলে, অনেক দম্পতিকেই সারা জীবন শিশুর পরিবেশ-সৃষ্টি এবং বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থায় অসংখ্য **ভুল** করে শেষ জীবনে পস্তাতে দেখা যায়।

উন্নত দেশে দুই থেকে পাঁচ-ছয় বছর বয়সের শিশুর শিক্ষায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এই বয়সে অনেক শিশু স্কুলে একত্র জড়ো হয়ে খেলাধুলা করে, নক্সা আঁকে, কাঠের বা মোটা কাগজের টুকরো জোড়া দিয়ে অনেক রকম প্যাটার্ন বা আকৃতি **তৈরী** করে; চিত্র-বিচিত্র বইয়ের ছবি দেখে, কাঠের অক্ষর দিয়ে খেলা করতে করতে শব্দ তৈরি করতে শেখে, **বস্তু** গণনা করতে করতে সংখ্যার ধারণা লাভ করে, আশে-পাশের সাধারণ **জিনিষ** ও পশু-পাখীর নাম শেখে, মজার মজার ছড়া আবৃত্তি করে। এই **ধরনের** ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সহজে ও স্বাধীনভাবে তাদের আপন আপন স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর চর্চা হতে থাকে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীরা **ধৈর্য্য** ধরে অনেকটা অলক্ষ্যে প্রত্যেকটি শিশুর বিশেষ **প্রবনতা** লক্ষ্য করে সেইসব দিকে ওদের বিকাশ লাভের সুযোগ করে দেন। এইভাবে, বেত ও ধমকের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে। আমাদের দেশে এর কতকটা আরম্ভ হয়েছে।

আমরা বিলেতি পদ্ধতির স্কুলে কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে **ইংরেজী** বোল শেখাচ্ছি, আর এইসব ছেলেমেয়ে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে নিজেদেরকে দেশের লোকের থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শিখছে। এতে উক্ত স্কুলসমূহের পরিচালকদের অর্থাগমের সুবিধা হচ্ছে বটে, কিন্তু ছোটো ছোটো ছেলেরা দেশের লোকের

কাছে পর বনে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের বাল্যশিক্ষার কোনো প্রকার ব্যবস্থা না থাকাতেই দেশের বড়োলোকেরা বহু অর্থ ব্যয় করে এই ধরনের শিক্ষার সহায়তা করবার একটা মস্ত অজুহাত পেয়েছেন। আসল কথা, যতদিন আমরা মাতৃভাষাকে সন্মান দিতে না পারব, যতদিন আমরা বিদেশী ভাষাকেই উচ্চ চাকুরির সোপান বলে জানব, যতদিন আমাদের কাজে দেশিয় ঐতিহ্যের চেয়ে বৈদেশিক চাকচিক্যই অধিক মনোহর বলে বোধ হবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কার নিরর্থক হয়েই থাকবে।

অভিধান দেখে বানানগুলো ঠিক করে নিচে লেখো।

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

যে কোনো শব্দের বানান নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে অভিধান দেখে ঠিক করে নেওয়া যায়।